Aí-¯í Mí

ভালোবাসার গল্প গুচ্ছ

কাইউম পারভেজ

আজ ১৫ই আগষ্ট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই তাঁকে নিয়ে দু'একটি ভালোবাসার গল্প আজ।

গল্পগুলো হয়তো সবার জানা তথাপি আজকের এই দিনে নতুন করে বলা–কওয়া। হাশমত আলীর গল্পটা দিয়েই শুরু করা যাক। হাশমত আলী ময়মনসিংহের একজন ভ্যান চালক। বঙ্গবন্ধুকে কোনদিন কাছ থেকে দেখেনি। মনে মনে মেঘ হয়ে ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে সারাক্ষণ প্রিয় নেতাকে। পয়ঁত্রিশ বছর আগে ঠিক আজকের এই দিনে হাশমত আলী হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত জানলো তার প্রিয় বঙ্গবন্ধু আর নেই। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। কি এক জেদ চাপলো মাথায়। পরিবার নিয়ে ঢাকায় চলে এলো। পেশায় যখন ভ্যান-রিক্সাচালক তখন যাহা ময়মনসিংহ তাহাই ঢাকা। প্রাণপ্রিয় নেতার হত্যার প্রতিশোধের পথ খুঁজতে খুঁজতে সময় পেরিয়ে গেলো হাশমত আলীর। কেউ হাঁক দিলো না - 'আর দেরী নয় প্রতিশোধের সময় বয়ে যায়'। প্রাণপ্রিয় নেতা চলে গেলেন। ছেলেরাও চলে গেল। মেয়েগুলোর - বিশেষ করে বড় মেয়ের কি হবে? রিক্সাচালানো আয়ের থেকে জমা করা পয়সা দিয়ে সাত কাঠা জায়গা কিনে রাখলো মেয়ে শেখ হাসিনার নামে। সময় গড়িয়ে যায়। মেঘে মেঘে তখন অনেক বেলা। হাশমত আলী মৃত্যুশয্যায়। পয়সার অভাবে তার চিকিৎসা হয়না। তথাপি স্ত্রী পরিজনের শত অনুরোধেও হাশমত আলী শেখ হাসিনার নামে কেনা জমিটা বেচতে নারাজ। ওটা তার মেয়ের। তার প্রিয় নেতার প্রিয় মেয়ের – যে নেতা হাশমত আলীকে এ দেশটা এনে দিয়েছেন। না, কারো অনুরোধ অনুনয় বিনয় কাজে আসেনি। হাশমত আলী একদিন বুকভরা দুঃখ অভিমান নিয়ে পরপারে চলে গেলেন।

হাশমত আলীর স্ত্রী রহিমা খাতুন ভিক্ষার থালা হাতে শেষ বয়সে নেমে পড়লেন রাস্তায়। ছেলে তখন রিক্সাচালক। টানাটানিতে সংসার অচল। প্রায়শঃই ওদের ঝগড়া শোনে প্রতিবেশী বস্তিবাসিরা। ক্ষুব্ধ ছেলে একদিন মাকে বলেই ফেললো – যা না তোর মেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে। গিয়া ক - তুমি তো এখন প্রধানমন্ত্রী, আমাগো জমিডা আর তোমার লাগতো না। আমাগোরে রেস্ট্রি কইরা দিয়া দাও। আমাগো তো আর সংসার চলে না। তো সেই নিত্যদিনের কাইজ্জাই একদিন এক সাংবাদিক শুনে ফেললেন সে পথ দিয়ে যেতে যেতে। বিস্তারিত জেনে নিয়ে কাগজে তা ছাপিয়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজর কাড়লো সংবাদটি। তিনি রহিমা খাতুনকে খুঁজে বের করালেন। অজানা মাকে বুকে টেনে নিলেন। রহিমার আজীবনের দায়িত্ব নিলেন। রহিমার জন্য ঘর তৈরী করে দিলেন। তাঁর নামে রেজিস্ট্রিকৃত জমি রহিমাকে ফেরতের ব্যবস্থা করলেন। রহিমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে প্রয়াত স্বামীর উদ্দেশ্যে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলো তুমি চাইয়া দেখো তোমার মাইয়া আমারে জড়াইয়া ধরছে। আমারে ফালাইয়া দেয় নাই। তুমি তার বাবারে ভালোবাসতা হে আমারে ভালোবাসতাছে। ভালোবাসা মরে না কোনদিন।

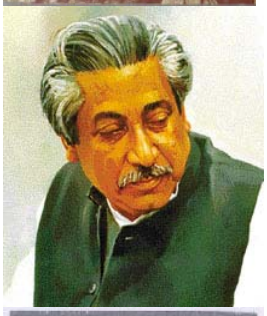

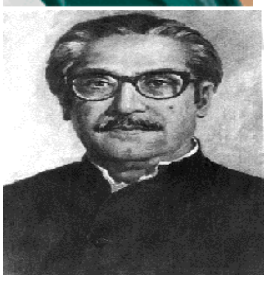

এবার ইমদাদুল হক মিলনের সেই বিখ্যাত গল্পটা।

পদ্মার ওপারে উদয়পুর গ্রামের কৃষক রতন মাঝি। গ্রামের খেটে খাওয়া দরিদ্র কৃষক। নিজের জমি নেই। অন্যের জমি চাষ করে। একবার সখ করে বাড়ির লাগোয়া জমিতে কালোজিরা ধান লাগিয়েছিলো চিড়া করবার জন্য। ধান থেকে তো চিড়া হলো। এবার রতনের বড় সখ চিড়াটুকু সে তার প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্য ঢাকায় নিয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধুকে প্রচণ্ড ভালোবাসে রতন। তাঁকে দুচোখ ভরে একবার দেখবে, তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখবে চিড়ার পোঁটলা, আর সেই ফাঁকে নেতার পা-টা ছুঁয়ে সালাম করে নিজের জীবনটা ধন্য করবে। অনেক কষ্ট করে যাতায়াতের খরচ জোগাড় করে, চিড়ার পোঁটলা বুকের কাছে ধরে আগস্ট মাসের এক মধ্যরাতে রতন রওনা দিলো লঞ্চঘাটের উদ্দেশ্যে। পাঁচ-সাত মাইল হেঁটে তারপর ভোরবেলায় লঞ্চ ধরলো রতন।

অবশেষে ঢাকায় এসে পৌঁছাল। মনে প্রাণে ভীষণ উত্তেজনা রতনের। প্রিয় নেতাকে এবার সে দেখবেই। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে নেতার বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলো। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। এত রাতে নেতাকে সে কী করে দেখবে? ভাবল, এই বাড়ির সামনেই সারা রাত বসে থাকবে। সকালবেলা নেতা যখন বেরোবেন তখন দুচোখ ভরে তাঁকে দেখবে রতন। চিড়ার পোঁটলাটা পায়ের কাছে নামিয়ে নেতাকে সালাম করবে। তা আর হলো না। পুলিশ সন্দেহ করল রতনকে। ধরে নিয়ে গেল থানায়। পুলিশ অফিসার তাকে জেরা করতে লাগল। রতন সরল ভঙ্গিতে বলে গেল সব কথা। অফিসার হাসলেন। নেতাকে দেখতে এসেছ মানে কী? নেতাকে তুমি চেনো? নেতা তোমাকে চেনেন? রতন অমায়িক মুখ করে বলল, নেতাকে কে না চেনে স্যার? তাঁরে চিনব না, এ হয় নাকি? নেতাও তো দেশের সব মানুষকেই চেনেন। মুখখানা দেখলে আমাকেও চিনবেন। আমিও তো দেশের মানুষ। গরিবের ভালোবাসা নেতাকে কেমন করে জানাব? ম্যালা দিনের স্বপ্ন ছিল তাঁরে একবার সামনাসামনি দেখব। পায়ের কাছে চিড়ার পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে পা দুখানা ছুঁয়ে সালাম করবো। আমার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা জানাব। রতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে আর হলো কই? আপনার লোকজন ধরে নিয়ে এল। মানুষ গরিব হতে পারি কিন্তু ভালোবাসাটা খাঁটি। আমাদের মতো গরিব মানুষরাই নেতাকে বেশি ভালোবাসে।

রতনের মুখে তারপর আর কথা নেই। পাথর হয়ে গেছে সে। হাজতে রাতভর বসে রইল। ভোরবেলা কেমন যেন একটা গুঞ্জন উঠল থানায়। কী রকম একটা ছুটোছুটি, চাপা ফিসফাস। খানিকপর সেই দুজন পুলিশ এসে গরাদ খুলল। রতন মাঝি, বেরোও। রতন নিঃশব্দে হাজতখানা থেকে বেরোলো। পুলিশ অফিসার গভীর দুঃখের গলায় বললেন - নেতা কাল রাতে নিহত হয়েছেন। তোমাকে সন্দেহ করে তোমার ওপর আমি অবিচার করেছি ভাই। যাও, বাড়ি যাও তুমি। ভালোবেসে বহুদূর থেকে নেতার জন্য চিড়া নিয়ে এসেছিল সে। কালোজিরা ধানের চিড়া কত যত্নে ....। দুজন ঠেলে ঠেলে তাকে এনে দাঁড় করালো সেই অফিসারের সামনে। এসব ভেবে জলে চোখ ভরে আসার কথা রতনের। কিন্তু হলো উল্টো। চোখ দুটো জ্বলে উঠল তার। অফিসারের দিকে তাকিয়ে শীতল গম্ভীর গলায় বলল, আমারে ছাইড়া দেওন ঠিক হইবো না স্যার। বুকে আমার আগুন। আমারে হাজতেই রাখেন। ছাইড়া দিলে কিন্তুক নেতা হত্যার প্রতিশোধ নিমু আমি। (মূল গল্প 'নেতা যে রাতে নিহত হলেন' থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত)

হাশমত আলী

ঢাকার এক রিক্সাআলা। তাঁর সঠিক নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আজকাল এমনই হয়। স্মৃতি আর বয়স একে অপরের সাথে প্রতারণা করে চলেছে। যাহোক সম্ভবত তাঁকে সবাই রিক্সা চাচা নামে চেনেন। বঙ্গবন্ধু যে সময়ে রিক্সায় চড়ে রাজনীতি করতেন তখন তাঁর রিক্সাটি ছিলো বঙ্গবন্ধুর বাহন। বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর একটা সখ্যতাও গড়ে উঠেছিলো। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর মিটিং মিছিলে তিনি থাকবেনই। রোজগার কামাই থাক বা না থাক। পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে তিনি আর রিক্সা চালান না এবং আর কাওকে সে রিক্সায় বসতে দেন না। ওই রিক্সায় পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে আর কেউ উঠতে পারেনি। তবে রিক্সাটি ঢাকায় আওয়ামী লীগের সভা সমাবেশ হলেই হাজির হয়ে যায়। রিক্সা চাচা ওটাতে তাঁর প্রিয় নেতার ছবি টানিয়ে 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি দিতে থাকেন।

১৯৯২ থেকে সিডনিতে আমার বাস। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তখন এমন একটা সময় যখন বঙ্গবন্ধুর নামটাও ভয়ে ভয়ে নিতে হতো। সংগঠনও ছিলো আর্থিকভাবে খুব দুর্বল। আমরা যখন ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালনের আয়োজন করতাম তখন পকেটের পয়সা দিয়ে যে যতটুকুন পারতাম এগিয়ে আসতাম। দেখা যেত তা দিয়ে মোট খরচের এক চতুর্থাংশও হতো না। তবুও আমরা হতাশ হইনি । আমাদের মাঝে একজন ছিলেন তসলিম মাহমুদ। বঙ্গবন্ধুর জন্য পাগল। মিটিং এ এসে চুপচাপ বসে থাকতেন। সব হিসেবনিকেশ টানাপোড়নের কথা শেষ হলে বলতেন – আপনারা যে যা পারেন দেন বাকীটা আমার। রাত জেগে অনেক পরিশ্রমলব্ধ ডলার (যা আমাদের প্রয়োজন) আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বলতেন আপনারা পয়সার চিন্তা করবেন না তবে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শোক দিবসের অনুষ্ঠান করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কথা সবাইকে মনে করিয়ে দিতে হবে। তিনি কখনো সভাপতি - সাধারণ সম্পাদক হতে চাননি। মঞ্চে উঠে মাইকও ধরতে চাননি। এই তসলিম মাহমুদ পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে অদ্যাবধি প্রতি বছর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাতে গরু কোরবাণী করেন। দোয়ার ব্যবস্থা করেন।

সংসদ সদস্য অভিনেত্রী এবং আইনজীবী তারানা হালিম পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে আর তাঁর জন্মদিন পালন করেন না। অথচ একজন আছেন ১৫ই আগষ্ট জন্ম না হওয়া সত্বেও আশির দশক থেকে হঠাৎ করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাঁর ভূয়া জন্মদিন পালন করে যাচ্ছেন। যে মানুষটির মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করে তিনি তাঁর ভূয়া রাজনৈতিক জন্মদিন পালন করে যাচ্ছেন সে মানুষটিই তাঁর প্রায় ভেঙ্গে যাওয়া ঘরটি আবার জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এটাও এক ধরণের ভালোবাসার গল্প হতে পারে। যে ভালোবাসা একজন দেখাতে পেরেছিলেন আরেকজন কিছুতেই পারলেন না। যিনি পেরেছেন তিনি কোটি কোটি হাশমত আলী, রহিমা খাতুন, রতন, রিক্সা চাচা, তসলিম মাহমুদ, তারানা হালিমের ভালোবাসা নিয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন। বাঙালির বুকে চিরস্থায়ী আসন গেঁড়ে নিয়েছেন। তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন – আকাশের তারারা যতদিন ততদিন।